Sri Gautam Bhattacharyya

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৯
দাম : ৫০ পয়সা

● রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধ—২ ● আমেরিকা, নিজহস্তে হয়োনা নিধন—৬ ● 'সল্ট'-২ চুক্তি উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য—৮
● গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (ঢাকা)—১১ ● স্কাইল্যাব কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত—১২ ● রিপোর্ট—১৩ ● পর্যালোচনা—১৫

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতা ও প্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও মূল বাহক বিজ্ঞান। তার সদর্থক সৃজনশীল শুভশক্তির কথা সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তস্নাত পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ওপর মানুষের আরোপিত দানবীয় ধ্বংসশক্তির কথাও কারুরই অজানা নয়। যুদ্ধ আজও থেমে যায়নি—অবিরাম চলেছে। যতদিন দেশে দেশে নানা জনবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদ থাকবে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ততদিন যুদ্ধও থাকবে। গোটা পৃথিবী একটা সুস্থিত সাম্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত যুদ্ধের উৎপত্তির কারণসমূহ ও তার ব্যাপকতালাভের সম্ভাবনা কোনসময়ই স্থায়ীভাবে লোপ পাবেনা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এরকম এক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান আজ যতটা না কল্যাণকামী মানুষের তার চেয়ে অনেক বড় সহায় অন্যায় যুদ্ধের এবং আগ্রাসী যুদ্ধবাজদের। এর দায়িত্ব অবশ্য বিজ্ঞান বা সাধারণভাবে বিজ্ঞানীদের নয়—বিজ্ঞানের যাবতীয় যথেচ্ছ অপব্যবহারের জন্য মূলতঃ দায়ী ব্যবহারকারী রাষ্ট্রশক্তির মুষ্টিমেয় নীতিনির্ধারক ও পরিচালকরা—যাদের মদত যোগান নানা খেতাব ও পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের এস্টাবলিশমেন্টমুখী রক্ষিতা একটি অংশ। ভালোর হাতে বিজ্ঞান যদিও শুধুই ভালো এবং সুফলদায়ী কিন্তু স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদ ও সুচতুর এই পরগাছা বিজ্ঞানীশ্রেণীর দুষ্টচক্রের হাতে সেই বিজ্ঞানই হয়ে ওঠে মানুষের দুর্বহ দুঃখের কারণ। তাই হচ্ছে আজ। তাকিয়ে দেখুন চারপাশে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো মানুষের প্রাণনাশী মারণযজ্ঞের কি বিপুল আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছে নিপুণভাবে! বোমা-বন্দুক কামান ট্যাঙ্ক মিসাইল-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কুট ক্রূর নানা যুদ্ধব্যবস্থা—যার মধ্যে আছে জৈবিক রাসায়নিক যুদ্ধ, (Biological and Chemical) পরিবেশগত যুদ্ধ (Envirnmental Warfare) প্রভৃতি বিভিন্ন মারাত্মক ব্যবস্থা। এ বিষয়ে ব্যাপক জনগণ ও বিজ্ঞানকর্মীদের সচেতন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য : তাই বর্তমান সংখ্যায় আধুনিক মিসাইল ও জৈবিক ও রাসায়নিক যুদ্ধ (Biological and Chemical Warfare) সংক্রান্ত লেখা দুটি আমরা প্রকাশ করছি—সঙ্গে থাকছে বিজ্ঞানকে ক্রমাগত একধরনের যুদ্ধমুখী চরিত্র প্রদানের (মিলিটারাইজেশান-এর) বিরুদ্ধে আমাদের সরোষ প্রতিবাদ।

যাইহোক, অন্তত এবারের মত স্কাইল্যাবের আক্রমণ থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে : উৎক্ষেপনের মুহূর্তেই যে স্কাইল্যাবটির মাঝপথে বিগড়ে যাবার সম্ভাবনার কথা টের পাওয়া গিয়েছিল তাকে তাড়াহুড়ো ক'রে শেষপর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কেন? এটা কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়? তাছাড়া, খবরটা মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রথমে বেমালুম চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কেন? শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রতিশ্রুতিই কি যথেষ্ট? একটিও প্রাণের ক্ষতিপূরণ কি কোনভাবে সম্ভব? তাছাড়া, ব্যাধি-খরা-বন্যা-মরু দুরন্ত নদী-সমুদ্র-অধ্যুষিত পৃথিবীর অসংখ্য সমস্যাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ও পাশ কাটিয়ে গিয়ে মহাকাশচারিতার এই বৃহৎশক্তিসুলভ বিজ্ঞান-বিলাস কি কোনমতেই আজ সমর্থনযোগ্য?

আমরা চাই লব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যত দূর সম্ভব কল্যাণমুখী ও গঠনমূলক সুষ্ঠু ব্যবহার। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সেই বিখ্যাত উক্তিতে আমাদের অটুট বিশ্বাস : "বিজ্ঞান তার গতিপথে ক্ষতি যা-ই করে থাকুক অতীত মানুষকে সুখসন্ধানের যে সব পথ দেখিয়েছে তার চেয়েও শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি সুখের নিশানা দিতে পারে বিজ্ঞান।" এই বিশ্বাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সুখ, শান্তি সমৃদ্ধির মুখ চেয়ে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়ক ও তাদের বশংবদ দেশী বিদেশী বিজ্ঞানীদের হাতে বিজ্ঞান প্রতিভা ও শক্তির ক্রমিক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক, সচেতন ও সংঘবদ্ধ হতে স্তনম সৎ ও বিবেকবান বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে আমরা সময়োচিত আহ্বান রাখছি।

রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধ

[The methods of chemical and biological warfare practised by USA in Indochina have been summarised. It has been shown how so-called scientific research conducted in university departments by renowned scientists is used to promote chemical and biological warfare. The possibility of similar clandsetine work going on in our country has been pointed out.]

এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে, প্রচলিত সমরাস্ত্র ব্যর্থ হতে শুরু করে। ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, সাজোয়া গাড়ী সমেত প্রচলিত যুদ্ধে আক্রমণকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়, চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নতুন নতুন যুদ্ধকৌশল বেছে নেয় - রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধের ব্যাপক প্রয়োগ এই স্তরে শুরু হয়। রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধের ব্যাপকতম প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই ইন্দোচীনের যুদ্ধে। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু রাসায়নিক আর জীবাণু যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি ও গবেষণা বহু দেশে আজও চলছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে আজ রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণার বিভিন্ন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। খোদ মার্কিন মুলুকে বেসরকারী নানা গবেষণাকেন্দ্রে নামী-দামী বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে গবেষণায় রত। রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধ ব্যাপারটা কি বোঝার জন্যে ইন্দোচীনের যুদ্ধের দিকে একবার তাকানো যাক।

ইন্দোচীনের যুদ্ধে রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য ছিল :

(১) গ্রামের ও বনজঙ্গলের গোপন জায়গা থেকে গেরিলা বাহিনীকে সহরাঞ্চলে আসতে বাধ্য করা, যেখানে মার্কিন সমরবাহিনী ও তার অনুচরদের সমরাস্ত্রে টেক্কা দেওয়া গেরিলাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

(২) শস্যক্ষেত, গাছপালা, জমি, বনাঞ্চল ধ্বংস করে গোটা ইন্দোচীনের জনগণকে ধ্ব স ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

(৩) বংশপরম্পরাকে বিকলাঙ্গ করে তোলা।

এই ছিল মার্কিনীদের 'পরিচ্ছন্ন' যুদ্ধের আসল চেহারাটি। এই ছিল তাদের 'ভিয়েতনামীকরনে'র পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এই ছিল শান্তি ও স্বাধীনতা প্রিয় ভিয়েতনামবাসীদের প্রতি দুনিয়ার 'মহান' অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গীর আসল স্বরূপটি। রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধের আসল চেহারাটি বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় আলোচনা প্রয়োজন। যেমন, রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধে ব্যবহৃত পদার্থগুলি কি ? এর ফলাফল কি ? কোথায় এই পদার্থের গবেষণা হয়ে থাকে ? এই রাসায়নিক ও জৈবিক যুদ্ধে বিজ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়া কি ?

রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থ : ইন্দোচীনের যুদ্ধে যে সমস্ত রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা নিচে দেওয়ার চেষ্টা করব।

যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ 'গুল্মনাশক' ও 'পাতাঝড়া' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মধ্যে 'এজেন্ট অরেঞ্জ', 'এজেন্ট হোয়াইট', 'এজেন্ট ব্লু' হল উল্লেখ যোগ্য।

এজেন্ট অরেঞ্জ ২, ৪, ডি আর ২, ৪, ৫টি এর মিশ্রণ। ২, ৪, ডি আর ২, ৪, ৫টি হল যথাক্রমে ২, ৪ ডাইক্লোরোফিনক্সি এসেটিক এসিড ও ২, ৪, ৫ ট্রাইক্লোরো ফেনক্সি এসেটিক এসিড-এর n বিউটিল এস্টার যৌগ। এজেন্ট অরেঞ্জ কোন অঞ্চলে ছিটিয়ে দিলে সেখানকার গাছপালা বনজঙ্গল অচিরেই সাফ হয়ে যায়, মানুষ ও প্রাণী জগতের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লাখ লাখ নজীর ইন্দোচীনে ছড়িয়ে আছে।

২, ৪ ডি আইসো প্রোপানলএমিন ও ট্রাই আইসো প্রোপানল এমিন পিক্লোরাম মিশ্রিত এজেন্ট হোয়াইট একাধারে যেমন শস্যক্ষেত ও গাছপালা ধ্বংস করে, যেমন জমির অনিবার্য্য ক্ষয়প্রাপ্তি হয়, তেমনি জনস্বাস্থ্যের পক্ষে এই পদার্থটি মারাত্মক ক্ষতিকর।

এজেন্ট ব্লুতে আছে সোডিয়াম ডাইমিথাইল আর্সেনেট ও ক্যাকোডিলিক এসিড বা ক্যাকডিলেট। এজেন্ট ব্লু ব্যবহারে গাছপালায় ক্লোরোফিল নষ্ট হয়, ধানগাছের ওপর এই পদার্থের প্রতিক্রিয়া চরমে পৌছোয়, মানুষ আর ও প্রাণীজগতের শরীরের বিভিন্ন অংশের সমূহ ক্ষতি করে, যেমন, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, পেট, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও অন্যান্য অংশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আবার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র বিকল করে দিতে পারে এমন কতকগুলি পদার্থ GA, GB, VX, এবং GD এই সাংকেতিক নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। GA অথবা ইথাইল ডাইমিথাইল এমিনোসায়ানো ফসফেট, যারযুদ্ধ সংকেত হল টাবুন, জন স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক

পদার্থ। 'উপদ্রুত' এলাকায় এর ব্যবহারের দরুন মানুষের দম বন্ধ হওয়া থেকে শুরু করে শ্বাস প্রঃশ্বাসের কষ্ট, চামরায় ক্ষতের সৃষ্টি, মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়ে থাকে। GB অথবা আইসো প্রোপাইল মিথাইল ফ্লোরফসফেট যার আরেক নাম হল সারিন, কম উদ্বায়ী বলে আরও বেশি ক্ষতি করে এবং কেবলমাত্র মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র অবশ করে মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। VX এর রাসায়নিক সংকেত ডাই ইথাইল এমাইনো ইথাইল থায়োফসফেট। এই পদার্থটিও একই রকম ক্ষতি করে থাকে। এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ ছাড়াও ও ক্লোরো এসিটোফেন বা CN, অর্থো-ক্লোরোবেঞ্জালম্যালোনাইট্রিল বা সি. এন অথবা ও. সি বি এন মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য কর্মক্ষমরহিত করে দিতে ওারে। এছাড়াও BZ নামে আর এক ধরণের পদার্থ ব্যবহার করা হয় যার ফলে স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেয় আর অচিরেই এর ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর ফল জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

এই সমস্ত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বহুল পরিমাণে ছড়ানো হয়েছে বনাঞ্চলে, শস্যক্ষেত্রে আর জনবহুল বসতি এলাকায়। কেবলমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামেই ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগের ওপর বনাঞ্চল ও শস্যক্ষেতে এই রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থ ছড়ানো হয়েছে। সেনেটর বেলমনের ভাষায় 'গত আট বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল ১০ কোটি পাউণ্ড গুল্মনাশক ছড়িয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ একর জমিতে বনাঞ্চল নষ্ট করার ও খাদ্যশস্য ধ্বংস করার জন্য। প্রতিটি শিশু, যুবা ও বৃদ্ধের মাথাপিছু এযাবৎ ৬ পাউণ্ড করে খরচ করা হয়েছে।"[১]

এই হলো রাসায়নিক যুদ্ধের পরিচয়। জীবাণুযুদ্ধে বিভিয় ধরণের জীবাণু ছড়িয়ে যেসব রোগ সংক্রামিত করা হয়েছে এবারে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

সাধারণত চার রকমের জীবাণু সংক্রান্ত রোগের লক্ষণ পাওয়া গেছে যার মধ্যে আছে ব্যাকট্রিয়া জাত রোগ যেমন এনথ্রাকস্ ও প্লেগ, রিকেটসিয়া জাত রোগ যেমন, কিউ-জ্বর ও পাহাড়ে জ্বর ; ভাইরাস জাত রোগ যেমন, পীত জ্বর ও এনসেফেলোমাইলাইটিস ; ছত্রাকজাত রোগ প্রভৃতি।

এনথ্রাক্স রোগের লক্ষণ হল প্রচণ্ড জ্বর, শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে আসা ও অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। আক্রান্ত ব্যক্তি ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মারা যেত পারেন। এই রোগে মৃত্যু হার অস্বাভাবিক রকমের বেশি।

কিউ-জ্বর ও পাহাড়ে জ্বর (Q fever ও Rocky mountain fever)-এর মধ্যে দ্বিতীয়টি অনেক বেশি মারাত্মক। পাহাড়ে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি তিনদিনের মধ্যেই মারা যান। এই দুয়ের জীবাণু বহন করে এঁটেলু পোকা।

ভাইরাস জাত পীত জ্বর, রিফট্ ভ্যালী জ্বর ও এনসেফেলোমাইলাইটিস জনস্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই মারা যান, যাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্বল্য লক্ষ্য করা যায়।

এই সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজরা যে শুধু ইন্দোচীনকে মানবতার বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল তাই নয়, বিজ্ঞানের অপব্যবহারের এক চূড়ান্ত নজিরও সৃষ্টি করেছে যা শুধু সে দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই গবেষণার নামে লোকচক্ষুর অন্তরালে যার একান্ত চর্চা চলছে। এই গবেষণার ভয়াবহ ফলাফলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে এমন কি খোদ মার্কিন মুলুকেই প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। সংগঠিত প্রতিবাদের ফলে কোন কোন গবেষণা বর্জিত হয়েছে, কিন্তু ইন্দোচীনে যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তীকালেও রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থের সমরমুখী গবেষণা ব্যাপক পরিমাণে চলছে।

বিজ্ঞান গবেষণার অন্তরালে : পেণ্টাগণের সমরবিদরা স্পষ্টই এটা বুঝতে পেরেছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বেসরকারী গবেষণা সংস্থার সাহায্য ছাড়া রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থের গবেষণায় তাৎপর্য্যপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব নয়। ফোর্ট ডেট্রিক, নিউ পোর্ট আর পাইন ব্লাফের সমর সম্ভার শস্যক্ষেত্র ও জনজীবন নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পেণ্টাগনের প্রয়োজন ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পে নিযুক্ত প্রবীন ও নবীন গবেষকদের যাদের গবেষণার ফলাফলে মার্কিন সমরবিদরা আরও পুষ্ট হবে।

পেণ্টাগণের কর্মকর্তাদের হিসেব থেকে দেখা যায় ১৯৬৬ সালেই ৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় পাঁচশ প্রকল্পে কাজ করেছিল যার ময়্যে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় ৫০ মিলিয়ন ডলার গবেষণার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করে ছিল। এমন কি পেণ্টগণের এ কথা বলতে দ্বিধা হয় না যে, "...শিক্ষার দিক থেকে দেখলে এই সমস্ত গবেষণা শিল্প সংক্রান্ত, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ের গবেষণার মতই, আর এর মধ্য দিয়ে স্নাতকদের চমৎকার প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়"২। এই ভাবে পেণ্টাগনের কর্মকর্তারা তাদের স্থানে গবেষণাকে বিজ্ঞান চর্চার সাথে গুলিয়ে দিতে চেয়েছিল।

যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক ও জৈবিক গবেষণার চুক্তি গৃহীত হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল :৩

আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অতি অল্প পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের সনাক্তকরণ ; উইসকনসিল বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্ভ গ্যাস এজেণ্টের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর এ ছাড়া ফার্মাসী বিভাগের অধ্যাপক ভুরস্টারের "রাসায়নিক পদার্থের ত্বকে প্রবেশ করার ক্ষমতা" বিষয়ে গবেষণা ; ওরিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের "লং টার্ম স্টাডি ইনটু দি এপিডেমিওলজি অফ হুইট রাস্ট" বিষয়ের গবেষণা যার উদ্দেশ্য ছিল সংক্রামণের ফলে গমের উৎপাদন কতখানি কমে যেতে পারে দেখা। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১১ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল "সংক্রামক ব্যাধির এপিডেমিওলজির ওপর"৪ গবেষণা করার জন্য। পীত জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর ও এনকেফেলাইটিস এর বাহক আর্বোভাইরাসের বিষয়ে কালিফোর্ণিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে ওকল্যাণ্ডের ন্যাশনাল বায়োলজিকাল লেবরেটরীর সহযোগিতায় গবেষণা এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রাকৃতিক বিষ "পাফার পয়জন" বিষয়ে গবেষণাও এই প্রচেষ্টারই অন্তর্ভুক্ত।

প্রায় সমস্ত নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পসংস্থাই লোকচক্ষুর অন্তরালে রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধের গবেষণায় মার্কিন সমরবাদীদের সহায়তা করেছে। কেবলমাত্র দেশের ভেতরেই নয়, বাইরে পশ্চিম জার্মানী জাপান প্রভৃতি দেশেও আমেরিকার এই যুদ্ধ গবেষণার জাল বিস্তৃত আছে। বাইরের দেশে গবেষণার জন্য কেবলমাত্র ১৯৬৭ সালেই .৫৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে পেণ্টাগণের কর্মকর্তারা।

কুখ্যাত পেণ্টাগণের পরিচালনাধীন I. D. A. (Institute of Defence Analysis) এর গোপন গবেষণা বিভাগ 'জ্যাসন' এর বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন দেশের ভেতরে ও বাইরে তুঙ্গে উঠেছে তখন আরও অনেক গোপন রহস্য ফাঁস হয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে এই কুখ্যাত সংস্থার সাথে যুক্ত সমরবিজ্ঞানীদের নাম। এই রকম একটি পোস্টার প্রদর্শন করেছিলেন "Collectif Intersyndical universitaire d' Orsay Vietnam- Laos-Cambodge" নামে একটি সংগঠন প্যারিতে ১৯৭২ সালের জুন মাসে। পোস্টারটীর নাম ছিল "যুদ্ধবাজ অধ্যাপকগণ"। এদের মধ্যে ছিলেন—

লুই আলভারেজ, জেমস বিওরকেন, রোজার ড্যাশেন, সিডনী ড্রেল,, ফ্রিমান ডাইসন, মারে গেলম্যান, ডোনাল্ড গ্লেজার, মারভিন গোল্ডবার্গার, নরমান ক্রল, উইলিয়ম নিরেনবার্গ, উলফগ্যং প্যনফস্কি, মেলভিন রুডারম্যান চার্লস টাওয়েনস, স্টিফেন ভাইনবার্গ, জন হুইলার, ইউজিন ভাইগ্‌নার, জর্জ জোয়াইগ।

এঁদের বিজ্ঞান-গবেষণার বিষয়: রাসানিক ও জীবাণু-যুদ্ধ, LASER-এর সামরিক প্রয়োগ, প্রতি-অভ্যুত্থানের কলাকৌশল, ইলেকট্রনিক যুদ্ধক্ষেত্র,.....।

১৯৭২ সালের ১৪ই জুন গেলম্যানকে প্যারির কলেজ দ্য ফ্রান্সে বক্তৃতা দানে বাধা দেওয়া হয় ও একদল বিজ্ঞানকর্মী তাঁকে কলেজ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। আন্দোলনকারীদের আহ্বান ছিল "পদার্থবিদ্‌গণ! এই সমস্ত যুদ্ধবাজ পদার্থবিদ্‌দের 'বিশুদ্ধ' পদার্থবিদ্যার কথা বলতে দিও না যতক্ষণ না তারা তাদের জ্যাসনে অংশগ্রহণ সরাসরি নিন্দা না করে ও ভিয়েতনামে আমেরিকান যুদ্ধাপরাধকে জনসমক্ষে ধিক্কার না জানায়।"[৫]

এত শত আন্দোলন সত্ত্বেও পেনটাগণের কর্মকর্তারা উদ্ভট আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে কাজ চালিয়ে গেছে। জেনারেল রথস্‌চাইল্ডের ভাষায়, "যদি আমরা সোভিয়েট রাশিয়া অথবা কম্যুনিষ্ট চায়নার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হই তা হলে রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধাস্ত্রের দিক থেকে আমরা সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে থাকব। রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধাস্ত্র অনেক বেশি সংখ্যায় জনশক্তির সাথে লড়াইয়ের পক্ষে বেশ উপযুক্ত হবে ...।"[৬]

এমন কি এই রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধের প্রকৃত তথ্যও গোপন করতে হচ্ছে পেণ্টাগণের সমরবিদ্‌দের। ১৯৬০ সালের ওর্য়াল্ড বুক অফ এনসাইক্লোপেডিয়ায় জীবাণু যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা হল, "জনসাধারণের কাছে জীবাণুযুদ্ধের আরেক নাম জনস্বাস্থ্যের উল্টোদিক। জনস্বাস্থ্য কর্মী রোগের মোকাবিলা করে। জীবাণু-যুদ্ধের ফলে যুদ্ধের বীভৎসতা কমে। এই জীবাণুশত্রুকে নিধন করার পরিবর্তে দুর্বল করে দেয়, যুদ্ধের পক্ষে অনুপযুক্ত করে ফেলে।" তবে সমস্ত রকমের মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে দেশ বিদেশের বিজ্ঞানকর্মীরা রাসানিক ও জীবাণুযুদ্ধের গবেষণার অন্তরালে যে গোপন বীভৎসতা আছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন ও এই জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে সচেষ্ট হ'য়েছেন।

ভিয়েতনামে এই রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধ এক গণহত্যার নিষ্ঠুর সাক্ষী। রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থগুলিকে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জনবসতি এলাকায়, যেখানে শিশু, বৃদ্ধ আর সন্তান সম্ভবারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বহু শিশু মাতৃগর্ভে নষ্ট হয়েছে আবার অনেক মহিলা প্রসব করেছেন মৃত সন্তান। যে পরিমাণ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ভিয়তনামে ছড়ানো হয়েছে তাতে হোয়াইটসাইড নামে একজন বিজ্ঞানীর অভিমত হ'ল যদি কোন ভিয়েতনামী মহিলা (৪০ কেজি) ২ লিঃ করে বিষাক্ত জল প্রত্যহ পান করেন তাহলে তিনি প্রতিদিন ১২০ মি গ্রা ২, ৪, ৫টি অথবা দেহের প্রতি কি গ্রা ওজনে ৩ মি গ্রা রাসায়নিক পদার্থটি গ্রহণ করবেন।[৮] এর ফলে সন্তানসম্ভবাদের গর্ভ নষ্ট হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পর্যবেক্ষন অনুযায়ী যদি এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ৫ লক্ষ লোকের বসতি এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে দেড় লক্ষ লোক আক্রান্ত হবে আর আশি হাজার তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারবে।

রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধের ফলে শস্যক্ষেতের যে অপরিসীম ক্ষতি হয় তার নজির হিসেবে বলা যেতে পারে: "১৯৫৯ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টন চাল রপ্তানী করে, আর ১৯৬৮ সালে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাল তারা আমদানী করে, যার শতকরা ৯০ ভাগ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ধ্বংস এখনও চলছে।"[৯]

মার্কিন সমরবাদীরা যে কেবলমাত্র 'পুড়িয়ে মার' এই নীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারছিল তাই নয়, আরেকটা দিক থেকেও তাদের লাভ হয়েছিল। অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের তুলনায় রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধাস্ত্রের খরচ অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রতি বর্গ কি. মি. ধ্বংস করতে প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্রের খরচ লাগে ২০০০ ডলার, নিউক্লিও অস্ত্রে লাগে প্রায় ৮০০ ডলার, রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রে লাগে ৬০০ ডলার আর জীবাণুযুদ্ধে লাগে এক ডলার মাত্র।

ভারতবর্ষে কি ঘটছে?[১০,১১] পঞ্চম লোকসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্টে যে কয়েকটি বিদেশী সহযোগীতায় গবেষণাপ্রসঙ্গে

এম. (Submarine launched ballistic missible, SLBM) ক্ষেপণাস্ত্রের উপর। এ ধরণের ক্ষেপণাস্ত্রের রণনৈতিক তাৎপর্য অন্য ধাঁচের। ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে এক মাথাব্যথা সর্বদাই অগ্রিম আঘাতের, অর্থাৎ প্রতিপক্ষ যদি আচমকা ক্ষেপণাস্ত্র মেরে আমার ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে ছাউনীতেই খতম করে দেয়। তাই উদ্ভাবিত হলো চলমান উৎক্ষেপকের। পারমানবিক শক্তি চালিত আধুনিক ডুবোজাহাজ চলমান উৎক্ষেপক হিসাবে উত্তম, কারণ এ'টি দীর্ঘ দিন উপরে না উঠে সমুদ্রের গভীরে ঘুরে বেড়াতে পারে। অন্যান্য সচল উৎক্ষেপকের মধ্যে দূরপাল্লার বোমারু বিমান পরীক্ষার ব্যাপারেও মার্কিন পক্ষ এগিয়ে রইলো।

১৯৭২ সালে 'সল্ট' ১ চুক্তির আগেই 'মার্ভ' করা শুরু হয়েছিলো। এই সাত বছরে রুশপক্ষ চারটি নূতন ধরনের আই, সি, বি, এম ও অন্তত: একটি এস. এল. বি. এম মোতায়েন করেছে। এ ছাড়া তারা উদ্ভাবন করেছে ভয়াবহ 'ব্যাকফায়ার' বিমান। আর একটি এস. এল. বি. এম. ও আর একটি শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বোমারু বিমান নিয়ে কাজ চলছে। মার্কিন পক্ষ এই সময়ে মিনিটম্যান-৩ ক্ষেপণাস্ত্রে 'মার্ভ' বসিয়েছে, শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বি-১ বিমান পরীক্ষা করে নাকচও করেছে, 'পোলারিস" এম. এল. বি. এম নাকচ করে উন্নততর "ট্রাইডেন্ট" ১, ২ ও এম. এক্স ধরনের সচল উৎক্ষেপক ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনের পথে এগিয়েছে। এই হল "সল্ট"-১ চুক্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দৌড়!

'সল্ট'-২ আলোচনার নেপথ্যে ঃ ১৯৭৮ সালের মধ্যেই রুশ পক্ষ এস. এস. ১৮ দিয়ে দুটি মারাত্মক পরীক্ষা করে ফেলে। একবার পরীক্ষা হয় একসঙ্গে চল্লিশটি ছোটো 'আর্ভ' লাগিয়ে, আর একবার দশটি প্রমাণ সাইজের 'আর্ভ' লাগিয়ে এক তাজ্জব পরীক্ষায় দু'বার 'আর্ভ' ছোঁড়ার ভান করে আসলে ছোঁড়া হয় তিন বারের বার। এই পরীক্ষাগুলির কথা জেনে মার্কিন রণনীতিবিদেরা বেশ ভয় পান। তাঁদের আশঙ্কা হয় যে, মোট এস. এস. ১৮ গুলির ভগ্নাংশমাত্র ব্যবহার করে বর্তমানে মজুত এক হাজার মিনিটম্যানের শতকরা নব্বইটিকেই এক আচমকা আক্রমণে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো রুশ পক্ষের এসে গেছে। মার্কিন পক্ষ আলোচনায় প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে ডাঙার ছাউনীর 'মার্ভ' করা ক্ষেপনাস্ত্রের সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা খুব চেষ্টা চালায় যাতে ক্ষেপনাস্ত্র পিছু ক'টি 'আর্ভ' থাকবে এবং লক্ষ্যবস্তু থেকে কতটা দূরত্বে এসে (আসল বা নকল) 'আর্ভ' মূল অস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়।

অনেক দর কষাকষির পর রুশ পক্ষ মার্কিন প্রস্তাবে রাজী হয়। তার বদলে মার্কিন পক্ষকে রাজী হতে হয় যে, যুদ্ধজাহাজ ও ডুবোজাহাজ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার প্রক্রিয়ায় ভাণ করার কারিগরি ঢোকানো চলবে না। 'ট্রাইডেন্ট' ১, ২ এবং দশটি পর্যন্ত 'আর্ভ' যুক্ত এম এক্স ক্ষেপণাস্ত্রের রূপায়ণ, আর উড়োজাহাজ থেকে ছোঁড়ার 'ক্রুজ' ক্ষেপনাস্ত্র তৈরী ও মোতায়েন করার অধিকারও মার্কিনরা পেলো। কিন্তু পরিবর্তে রুশ পক্ষকে ৩০৮টি এস. এস ১৮ মানের ক্ষেপনাস্ত্র রাখতে দিতে হল এবং মার্কিন পক্ষকে মেনে নিতে হল যে এই মানের ক্ষেপনাস্ত্র তারা তৈরী করবে না। তাছড়ো মিনিটম্যান'এ 'আর্ভে'র সম্ভাব্য সংখ্যা সাত থেকে নামিয়ে আনতে হল তিনে, এবং সর্বোপরি স্বীকার করতে হল যে রুশ 'ব্যাকফায়ার' মান রণনৈতিক অস্ত্র নয়, যদিও এই বিমানকে অনায়াসে ক্ষেপনাস্ত্রবাহী করা যায়। আরও ছাড়তে হল মার্কিন পক্ষকে 'ক্রুজ' বা অন্য ক্ষেপনাস্ত্রবাহী বোমারু বিমানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হল, ডাঙা বা জল থেকে ছোঁড়া 'ক্রুজ' ক্ষেপনাস্ত্রের পাল্লার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধা হল এবং এম এক্স ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা বা মোতায়েত করা নিষিদ্ধ রইলো।

'সল্ট'-২ চুক্তির পর কী ? ঃ—পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের বুলেটিনের আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। রুশপক্ষকে ডাঙায় মোতায়েন করার জন্য যে কোনো এ'টি নতুন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাদের এস. এস ১১ ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য আধুনিক কঠিন জ্বালানী ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৮১ সালের পর ক্ষেপণাস্ত্রের উড়নপরীক্ষার উপর নিষেধ থাকবে না, যে কোনো পাল্লার ডাঙা বা জল থেকে ছোঁড়ার 'ক্রুজ' ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা যাবে, এম এক্স ক্ষেপনাস্ত্রের পরীক্ষা বা মোতায়েনের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। বিশেষ কিছু কাজ বাদ দিয়ে যে কোনো ক্ষেপাণাস্ত্রের শতকরা পাঁচভাগ পর্যন্ত উন্নয়ন করা যাবে।

সারা পৃথিবীকে কয়েক বার ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট পারমাণবিক অস্ত্র এখন দু'পক্ষের হাতে। ফলে পরিমাণের চেয়ে উৎকর্ষই এখন রণনৈতিক অস্ত্রের দৌড়ের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু 'সল্ট' চুক্তিগুলির মূল বিষয়বস্তু এখনও সংখ্যার সীমা টানা।

তবে কি 'সল্ট' চুক্তিগুলি কেবলই ছায়াবাজি? ব্যাপারটি এত সহজ নয়। আজ অস্ত্রের দৌড় মার্কিন ও রুশ অর্থনীতির উপর বেশ চাপ ফেলছে। এ ছাড়া সর্বদাই ভয় পাছে এক পক্ষ অন্যের অজান্তে এক নিয়ামক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। তাই দুই পক্ষই আজ চোখ বন্ধ রেখে পাগলের মতো না হাতড়িয়ে, পরস্পরের অবস্থা জেনে বুঝে নিয়ন্ত্রিতভাবে অস্ত্রের দৌড় চালাতে চাচ্ছে। মার্কিন সাপ্তাহিক 'টাইম'-এর ভাষায় (২১, ৫, ৭৯) "পারমানবিক যুদ্ধ থেকে (বিবদমান পক্ষদের) বিরত রাখার জন্য 'সল্ট' এক রণনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে, যাতে প্রতি অতিবৃহৎ শক্তির হাতেই এমন ক্ষমতা থাকে যার বলে আচমকা পরমাণবিক আক্রমণের শিকার হওয়ার পরেও প্রতিপক্ষ হজম করতে পারবে না এমন প্রত্যুত্তর সে দিতে পারবে।" কিন্তু এক পক্ষ কোনো ব্যাপারে এগিয়ে গেলেই এই 'ভয়ের ভারসাম্য'

বজায় রাখার জন্য অপর পক্ষকে এগোবার অনুমতি দিতে হচ্ছে, কারণ সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের কোনো প্রস্তাব দু'পক্ষের কেউই মানতে নারাজ। অর্থাৎ অস্ত্রের দৌড়ের খেলা কোনো পক্ষই বন্ধ করতে চাচ্ছে না, চাচ্ছে খেলা কিছু নিয়ম মেনে 'সুষ্ঠু' ভাবে হোক।

নিয়ম মানার ব্যাপারে কোনো পক্ষই অপরকে বিশ্বাস করে না। তাই দিনে দিনে গুরুত্ব পাচ্ছে মহাকাশবিজ্ঞান—কৃত্রিম উপগ্রহগুলি আজ ক্ষেপনাস্ত্রশক্তির উপর গোয়েন্দাগিরির প্রধান হাতিয়ার। গোয়েন্দাগিরি ঠেকাতেও আসছে অত্যাধুনিক যন্ত্রকৌশল। 'সল্ট'-২ আলোচনাতে ঝড় ওঠে 'টেলিমেট্রি' নিয়ে—ইলেকট্রনিক্সের এক কারিগরি যার বলে ক্ষেপনাস্ত্র তার উড়নপরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য ভূপৃষ্ঠে পাঠাতে পারে। ঝড়ের কারণ, রুশপক্ষ এই তথ্যকে গোপন 'কোড'বদ্ধ করার কারিগরি ব্যবহার করছিলো। কথা হয়েছে যাতে কেউ এইভাবে 'কোড' ব্যবহার করে গোপনে ক্ষেপনাস্ত্রের ক্ষমতার নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন না করতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের সমস্ত অবদানকেই যুদ্ধবাজরা ব্যবহার করছে অস্ত্রের দৌড়ে।

বড়ো যুদ্ধের মুখোমুখি এসে আধুনিককালে প্রধান শক্তিরা প্রতিবারই অস্ত্রের দৌড়ের নিয়ম বাঁধার খেলা খেলেছে। ১৮৯৯ সালে এক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হল। কিন্তু আলোচিত হল কার্যতঃ অস্ত্রের দৌড়ের নিয়ম। ১৫ বছর পরেই লাগলো প্রথম মহাযুদ্ধ। ১৯৩২-৩৩ সালে আবার চলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন। এবার ৭ বছরের মধ্যেই বেধে গেলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আজ আবার বিশ্বের বিজ্ঞানকর্মীরা দেখছেন যে তাঁদের কাজের সমস্ত ফলকে কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে যে অস্ত্রের দৌড়ে। আবার আগের দু'বারের মতো না হয়। তাই সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানকর্মীরা জড়ো হচ্ছেন সামগ্রিক ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের আওয়াজকে কেন্দ্র করে। 'সল্ট'-এর ধোঁকার বিপরীতে, বিশ্বশান্তির পথে এটিই হবে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

With best compliments from :

BHARAT FRITZ WERNER PRIVATE LIMITED

8, INDIA EXCHANGE PLACE, CALCUTTA-700 001

Phone : 26-9334

MACHINE TOOLS MANUFACTURERS IN COLLABORATION WITH
Messrs FRITZ WERNER WERKZEUGMACHINEN
BERLIN, WEST GERMANY.

PRODUCT RANGE :

Knee Type Milling Machines—Vertical, Horizontal and Universal in sizes : 0, 1, 1·5 & 3

Hydro Copy Millers, Production Millers, Hand-operated Unit Heads, Universal Tool & Cutter Grinders with All Indigenous Accessories Readily Available. Hydro-Electrically Operated SPMs based on Unit Construction. Prompt After Sales Service.

Regd. Office : PEENYA, BANGALORE-560022

Other Branches : BOMBAY, MADRAS, NEW DELHI, HYDERABAD, COCHIN, POONA.

জীবাণু যুদ্ধ সংক্রান্ত স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সেই প্রকল্পগুলি হ'ল :

(১) দি জেনেটিক কণ্ট্রোল অব মস্কুইটো ইউনিট (জি সি এম. ইউ.) প্রোজেক্ট।

(২) বম্বের ন্যাচরাল হিসট্রি সোসাইটিতে দেশান্তরী পাখিদের ও আর্বোভাইরসের উপর গবেষণা।

(৩) যোধপুরে শহরের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য অতি কম মাত্রায় স্প্রে পরীক্ষা।

(৪) পন্থনগরের মাইক্রোবিয়াল পেষ্টিসাইড প্রকল্প।

(৫) জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কলকাতা ও ওয়ারঙ্গোলের কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প।

পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট সত্বেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এই বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করে নি। পরবর্তীকালে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী এইচ সি সারিন কে চেয়ারম্যান পদে এবং এম. জি. কে মেনন ও এম. এস. স্বামীনাথনকে সদস্যপদে নিযুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করেন ও বলা হয় এই কমিটি পি এ সি রিপোর্ট যাচাই করে দেখবে এবং তাদের অনুমোদন পেশ করবে। এই কমিটি প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পগুলির পক্ষেই ওকালতি করেছে এবং পি এ সি যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে তাও এই কমিটি জোলো করে দিয়েছে। জি সি এম ইউ প্রোজেক্ট কোন জীবাণুযুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণা আদৌ চলছে কিনা তা আলোচনা না করেই জি সি এম ইউ প্রকল্পের সাফাই গাওয়াটাই যেন তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমিটির মতে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে দু' তরফের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের প্রকল্পটি গ্রহণ করার সময় ও কাজ চলার সময় কোন রকম দুরভিসন্ধি পরিলক্ষিত হয় নি, এমন কি বিশেষজ্ঞদের আচরণেও জীবাণুযুদ্ধের গবেষণা সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি যাঁরা জি সি এম ইউ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন তাঁরা (ভারতীয় বিজ্ঞানীদের) নিতান্তই একটি ছোট অংশ। জীবাণুযুদ্ধের গবেষণা সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী মহলের অসচেতনতার সুযোগ যদি কোন কমিটি গ্রহণ করার ইচ্ছে থাকে তা'হলে সেই কমিটির উদ্দেশ্যের সততা নিয়ে কি প্রশ্ন তোলা যায় না ? যাই হোক, কমিটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন করলেও পণ্ডিচেরীর ভেক্টর কণ্ট্রোল রিসার্চ সেন্টারের কাজকর্ম সম্পর্কে একেবারেই নিশ্চুপ কেন, বিশেষত যখন জানা ছিল সেখানে পীতজ্বর ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান। কমিটি একই রকমভাবে ইউ এস পাবলিক হেলথ সার্ভিস (যার অর্থে এই প্রকল্পটি চালু) সম্পর্কে নিশ্চুপ এবং এমনকি এই প্রকল্পে প্রধান পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষমতাও এখনও পর্যন্ত সংস্থাটির হাতেই আছে। এর ফলে এই কমিটি প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের পরিবর্তে আসল সমস্যাকে আড়াল করতে চাইছেন। ভারতবর্ষের মাটিতে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থার নানা কার্যকলাপের মধ্যে লোকচক্ষুর আড়ালে এই সমস্ত জন-বিরোধী গবেষণার দু'একটি দৃষ্টান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে থেকে দেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি জার্মান সহযোগিতার ভূমিদাস প্রথার ওপর একটি প্রকল্পে বিহারের পালামৌ জেলার লোকজনের কাছ থেকে, রক্ত, মল, মূত্র নিয়ে পরীক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুকাল আগে ইউ এস প্রতিরক্ষা এজেন্সীর লোকেরাও এই জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। এই পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি যে জীবাণুযুদ্ধাস্ত্রে গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয় নি এমন গ্যারাণ্ট বোধ করি দেওয়া সম্ভব নয়। দেশান্তরী পাখীদের নিয়ে গবেষণা প্রকল্পে সহযোগী স্মিথমেনিয়ান ইনষ্টিটিউটকে এবার লাদাকে একটি এনথ্রোপলজিকাল ফিল্ম তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণা প্রকল্প কার স্বার্থে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

উপসংহার

রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধ যে কেবলমাত্র ইন্দোচীনেই সংগঠিত হয়েছে তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এই যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নামে-বেনামে এই জাতীয় গবেষণা চলেছে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানকর্মীরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। এ বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় SESPA (Scientists and Engineers for Social and Political Action),

"Collectif Internationales Universitaire d'r Orsay Vietnam-Laos-Cambodge" প্রভৃতি সংগঠন কর্তৃক প্যারিসে, কর্সিকায়, ভ্যারেনায়, ত্রিয়েস্তে ও অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত আন্দোলন। গেলম্যান, সীডনী ড্রেল, উইনগার, হুইলার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের প্রবল বিক্ষোভের মুখোমুখি হন। যদিও এই প্রতিরোধ আন্দোলন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহলেও এই আন্দোলনের ঢেউ যে প্রশ্নগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরছে তা হ'ল মানবসভ্যতার ধ্বংসের মুখে নির্বিকার চিত্তে বিমূর্ত বিজ্ঞান গবেষণা কি 'নিরপেক্ষ' বিজ্ঞানচর্চার অছিলায় এ অপই-কৌশলকেই মদত যোগায় না ? তা কি সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদেরই শক্তি-শালী করে না যারা ব্যক্তিগত ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, বিত্তলালসার দরুণ ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যার নবতম পদ্ধতি আবিষ্কারে নিয়োজিত ? এই বিধ্বংসী ধারার পরিবর্তে যে সুস্থ প্রতিবাদ আন্দোলন দেশে দেশে সংগঠিত হয়েছে তা কি ভারতবর্ষের বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে এই দাবী উপস্থিত করে না যে ভারতবর্ষের মাটি থেকেও এই মারণযজ্ঞের সবরকম গবেষণা প্রচেষ্টা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক ?

সূত্রপঞ্জী : (১) 'ভিয়েতনামিস ষ্টাডিস : কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার', (সম্পাদনা : নগুয়েন খাক ভিয়েন), ২৯ নং ১৯৭১ পৃঃ ৯৬।

(২) 'কেমিক্যাল এণ্ড বায়োলজিকাল ওয়ার ফেয়ার', সেমর এম, হার্স, (প্যান্থার মডার্ন সোসাইটি, ১৯৭০), পৃঃ ২১৯-২২৩।
(৩) ঐ পৃঃ ২২৫
(৪) ঐ পৃঃ ২২৬-২২৭
(৫) 'দি ওয়ার ফিজিসিস্ট', (সম্পাদনা : ব্রুণো ভিটেল), (ইনষ্টিটিউটে দি ফিজিকা থিওরিকা) পৃঃ ৮৬।
(৬) 'কেমিকাল এণ্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার', সেমর এম, হার্স পৃঃ ২৩৮
(৭) ঐ পৃঃ ২১৫
(৮) ভিয়েৎনামিজ স্টাডিস : কেমিকাল ওয়ারফেয়ার, (সম্পাদনা : নগুয়েন খাক ভিয়েন)। পৃঃ ৭৩
(৯) ঐ পৃঃ ১০৫
(১০) ইকনমিক এণ্ড পলিটিকাল উইক্‌লি, স খ্যা ১৪/৪ পৃঃ ৯৮৬-৮৭
(১১) সায়েন্স টু-ডে, জুন জুলাই, ১৯৭৫।

পার্থ সেন
নরসিংহ দত্ত কলেজ

কবিতা

আমেরিকা, নিজ হস্তে হয়োনা নিধন

(—টেক্সাস এয়ার শো'র প্রতিবাদে)

[মার্কিন বিমানবাহিনীর ভূতপূর্ব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পল ডব্লিউ টিবেট্‌স্‌-এর নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালে টেক্সাস শহরে হিরোশিমার পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষামূলক মহড়াপর্ব পুনরনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল অতীতের ভুলভ্রান্তি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া যাতে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরো নিপুণ ও নির্ভুলভাবে ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করা যায়। এই মহড়াপর্ব জাপানের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের খুব সংগতভাবেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে। কারণ, পরমানবিক বোমা অন্তত জাপানী জনগণের কাছে আর কোনদিনই খেলা বা খেলার সামগ্রী হতে পারবেনা। সাদোকা কুরিহারা জাপানের একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় কবি। তিনি ওহিওস্থিত উইলিংটন কলেজে পিস রিসোর্স সেণ্টারের হিরোশিমা-নাগাসাকি স্মৃতি সংগ্রহশালায় এই স্বরচিত কবিতাটি পাঠিয়ে দেন। গভীর ক্রোধ, দুঃখ ও আশাবাদ নিয়ে তিনি কবিতাটির বক্তব্যের প্রতি আমেরিকা-বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল "Peace and Change: A Journal of Peace Research" পত্রিকার ৭৭ সালের বসন্তকালীন সংখ্যায়। সম্প্রতি "দি বুলেটিন অফ দ্যা অ্যাটমিক সাইন্‌টি." পত্রিকার জানুয়ারী '৭৯ সংখ্যার চৌদ্দ পৃষ্ঠায় কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। বর্তমানক্ষেত্রে কবিতাটি এই সূত্রেই প্রাপ্ত —সম্পাদক]

এক নতুন প্রজন্মের ভোরে
যখন শান্তিপার্কের গ্রাণাইট শিলাখণ্ডের পরে দেয়ালের লিখন
প্রাচীন ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে-আনা এক বিস্ময় মনে হয়
তখন অনুসন্ধানের বিষয় হ'ল :
"সেদিনে কি 'ভুল' হয়েছিল ?"
সমুদ্রের ওপরে
মুক্তবায়ুতে আয়োজিত হয়েছিল হিরোশিমার আকর্ষণী (!) মহাড়াপর্ব !
একদলা কৃত্রিম মেঘ গর্জে উঠেছিল
টেক্সাসের হেমন্তী আকাশেয় চূড়োয়।
দর্শকেরা
আগুনের ঝলসানিতে কিন্তু সেদিন পুড়ে ছাই হয়নি,
চিতাভস্ম মাটির 'পরে বিছিয়ে দেয়নি চাদর
আলকাতরার মতো কালো বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়নি মৃত্তিকার স্তর।

সেই ক্রোধান্ধ আগুনের শিখায় যাঁরা দগ্ধ হয়েছিলে
গলে গিয়েছিল যাদের শরীর তোমরা মৃত,
আগুনের তাড়া খেয়ে নদীতীরের দিকে যাঁরা ছুটে গিয়েছিলে বাঁচবার আশায়
শেষে চাপা পড়ে গেলে একে অন্যের 'পরে—হায় তোমরা মৃত।
শতশত গলিত শবদেহের কালো ঢেলায় পরিণত হয়েছিলে তোমরা,
আগষ্টের গা-গলানো রোদ্দুরে ঝলসানো মাটির 'পরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে
পচে যাচ্ছিলে তোমরা,
জঞ্জালের মত গ্যাসোলিন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হল যাদের স্তূপীকৃত
অর্ধদগ্ধশরীর—তাঁরা তোমরা। পালাবার জন্য ছোটাছুটি করছিল যারা,
যাদের হাড় থেকে মাংসপিণ্ডগুলো দুলছিল তারঝোলা বস্তুর মত ;
শেষে মাঝপথে সব হুমড়ি খেয়ে পড়লে মাটিতে—সেই তোমরা মৃত।
রিলিফ ক্যাম্পে খড়ের খসখসে মাদুরে শুয়ে তোমরা মারা গিয়েছিলে
শয়ে শয়ে

মাথা থেকে ঝরে পড়ছিল চুল, গা ফেটে ফেটে চুঁয়ে পড়ছিল রক্তবিন্দু
শেষে ঢলে পড়লে রক্তস্রাবী মৃত্যুর কোলে।
আর এ সবকিছুর জন্য দায়ী শুধু একটি বোমা,
যে দিনের বুকে ঢেলে দিয়েছিল রাত্রির অমা,
গ্রীষ্মের খরদাহকে পাল্টে দিয়েছিল শৈত্যপ্রবাহে
পৃথিবীতে প্রাণশেষের নজির বানিয়েছিল হিরোশিমা।
না, তোমাদের কণ্ঠস্বর কারো কানে পৌঁছয়নি।

এখনও সেই শব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে
বিকিরণরশ্মির বিষফলে আক্রান্ত মানুষের শরীরে ;
যাঁরা প্রাণে বেঁচেছেন গোপন ক্ষত লুকোবার চেষ্টা তাঁদের,
ব্যস্ত প্রহরে মস্ত বাড়ীগুলোতে বিস্মৃতি ও বিষন্নতার অপস্রিয়মান ছায়ার
মত তাঁদের দিনগুজরোনো।
দুই অথবা তিন পুরুষ পরে হঠাৎ লিউকোমিয়া আক্রান্ত শিশুদের ভিড়
বাড়ে হাসপাতালে
একত্রিশ বছরের ক্ষুদে মাথাওয়ালা মানুষ বিকৃত শিশুর মত ব্যা ব্যা করে
কথা বলে
বয়স্ক বাবা-মার বুকে জ্বলে নীরব ব্যাথা।

"অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি করবোনা"
আমরা শপথ নিয়েছিলেম।
প্রতিজ্ঞার পালা আজ তোমার, আমেরিকা
যারা হাতে ধরে আছো বোমার শক্তিশেল।
লক্ষবার হিরোশিমা দগ্ধ করবার বর্বর দুঃস্বপ্নে
আজ আত্মঘাতী হয়োনা, আমেরিকা।
যখন লক্ষ লক্ষ হিরোশিমা হয়ে ফেটে পড়বে তোমার স্বদেশ, আমেরিকা
মৃতদেহগুলো ছিটকে যাবে আকাশের দিকে
তখন কিন্তু এক নিমেষও ভাববার সময় থাকবেনা "হায়, হিরোশিমা।"
তখন আমি সহানুভূতির চিঠি পাঠাবো হিরোশিমা নাগাসাকির তিনশো
হাজার মৃত মানুষের নামে
আর তোমাদের বীর পুঙ্গবদের জন্য যারা বলে বেড়ায় "হুজুর বললে
মুহূর্তে হাজার হিরোশিমা বানাতে পারি"—তাদের জন্য সাবধান বাণী।
ক্লেদাক্ত কৃত্রিম মেঘের সামিয়ানার নীচে যে জাহান্নাম বানিয়েছ তোমরা
ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করতে পারেন—
কখনো পারে না মানুষ।

মূল কবিতা : **সাদোকা কুরিহারা**
অনুবাদ : **সুব্রত ভট্টাচার্য**

Space Donated By

TURNER AND TOOLS
15, GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA-700013
PHONE : 26-0838

Dealers of :
Workshop & Special Purpose Machinery

'সল্ট'-২ চুক্তি ঃ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

সম্প্রতি রুশ-মার্কিন দুই পক্ষ রণনৈতিক অস্ত্রশস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি 'সল্ট'-২ সই করেছে। প্রতিবারের মতো এবারও নিজের-নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে দুই পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে বিশ্বশান্তির তরফে এক বিরাট পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছে। বিশ্বের বিজ্ঞানকর্মীরা কিন্তু এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের এক মুখপত্র 'বুলেটিন অফ দি এ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট্স্' কাগজের ফেব্রু '৭৯ সংখ্যায় বলা হয়েছে: 'আংশিক (পারমাণবিক) পরীক্ষা নিষেধ-চুক্তি'র দাম দিতে হয়েছিলো মাটির তলায় বোমা ফাটানোর এক দুর্মূল্য ও যথেচ্ছ কার্যক্রমের মারফৎ। 'মার্ভ' করা ক্ষেপণাস্ত্র এবং 'ট্রাইডেন্ট' ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ডুবোজাহাজ মোতায়েন করতে দিয়েই 'সল্ট'-১ ও এ. বি. এম. (anti-ballistic missile. ABM) ক্ষেপণাস্ত্রধ্বংসী অস্ত্র ব্যবস্থার উপর নিষেধাজ্ঞার পরিপূরণ করতে হয়েছিলো'। বুলেটিনে বলা হয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট করে দেয় এমন নূতন নূতন ব্যবস্থার সীমারেখা টানার প্রচেষ্টা শুরু হবে 'সল্ট'-২ চুক্তি থেকে। কিন্তু এই ঘোষণা অনেকটাই অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। জলে স্থলে-অন্তরীক্ষে আরোহীবিহীন চলমান 'ক্রুজ' (cruise) ক্ষেপণাস্ত্রবাহী বিভিন্ন রণনৈতিক ব্যবস্থা এবং ডাঙায় চলমান এম. এক্স ক্ষেপণাস্ত্র রূপায়ণের অনুমতি মিলে গেছে, এবং আরও পেছু হটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'সল্ট'-২ চুক্তির আগে পর্যন্ত রণনৈতিক অস্ত্রের দৌড়ঃ দূর থেকে ভারী পারমাণবিক বোমা ছোঁড়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাগুলিকে রণনৈতিক অস্ত্রশস্ত্র বলা হচ্ছে আজকাল। এক সময় পর্যন্ত দুই পক্ষের চেষ্টা ছিলো আরও আরও বড়ো হাইড্রোজেন বোমা দূর-দূরান্তরে শত্রুর ঘাঁটিতে নিয়ে ফেলার মতো শক্তিশালী আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র আই. সি বি. এম. (ICBM) উদ্ভাবন। 'আংশিক পরীক্ষা নিষেধ-চুক্তি'র ফলে দুই পক্ষ বায়ুমণ্ডলে বোমা পরীক্ষা বন্ধ করে। আসলে বোমাগুলি এতো বড়ো হয়ে পড়েছিলো যে, আকাশে ফাটালে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ছাই যতটা জায়গা জুড়ে পড়ছিলো তা রুশ-মার্কিন দেশ সুদ্ধ সারা পৃথিবীর মানুষের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলো। এই নিষেধ-চুক্তির পরই শুরু হ'ল মাটির তলায় বোমা পরীক্ষার দৌড়।

পরের ধাপে শুরু হল ক্ষেপণাস্ত্রধ্বংসী এ. বি. এম. ব্যবস্থা নিয়ে কাজ। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্রের শেষ পাল্লার রকেটের ধ্বংসপিণ্ডগুলি ও ধোঁকার টাটি নকল অস্ত্রের মধ্যে থেকে আসল বোমাটিকে খুঁজে বার করে ধ্বংস করার ক্ষমতা গঠনের জটিলতা ও খরচ বড়োই বেশি পড়তে লাগলো। হিসাবে দেখা গেলো যে, এ. বি. এম. ব্যবস্থার খরচের চাইতে, ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা যতো বাড়ালে এ. বি. এম. ব্যবস্থা ভেদ করেও কিছু অস্ত্র লক্ষ্যভেদ করবেই, তার খরচ কম পড়ছে। তাছাড়া এই পর্যায়ে দুই পক্ষের হাতে পরস্পরের রণনৈতিক ঘাঁটিগুলিকে বেশ কয়েকবার ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা জমে গিয়েছিলো। 'সল্ট'-১ চুক্তি কী করলো? প্রায় পরিত্যক্ত এ. বি. এম. ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হলো। আর এমন এক সময় 'সল্ট'-১ চুক্তি ক্ষেপণাস্ত্রের সীমা বাঁধলো, যখন কার্যতঃ আর ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন কোনো পক্ষেরই ছিলো না।

এরপর প্রধান কাজ দাঁড়ালো ক্ষেপণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানো। 'সল্ট'-১ চুক্তির আগে থেকেই জোর গিয়ে পড়েছিলো ক্ষেপণাস্ত্রকে 'মার্ভ' করা আর ডুবোজাহাজ থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা প্রচলনের উপর। 'মার্ভ' প্রক্রিয়ায় (multiple in dependently-targetable re-entry vehicles, MIRV) ..... প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্রে রাবণের মাথার মতো বেশ কয়েকটি পারমাণবিক বোমা সাজানো থাকে। নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ৮০০০ কিলোমিটার পাল্লার একটি আই. সি. বি এম. বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠের ১১০০ কিলোমিটার মতো উপরে উঠে যায়। আধ ঘন্টা মতো পরে বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে প্রবেশ করার সাথে সাথে **বিভিন্ন** লক্ষ্যবস্তুর দিকে আলাদা আলাদা 'আর্ভ' (IRV) বোমাগুলি ছুটে যায়। 'মার্ভ ব্যবস্থায় তাই এক ক্ষেপণাস্ত্র সমকক্ষ হয়ে ওঠে একাধিকের। সংখ্যার সর্বোচ্চসীমা বাঁধা নিরর্থক হয়ে যায়। এই গবেষণায় এগিয়ে গেলো রাশিয়া। এখন রাশিয়ার প্রধান ক্ষেপণাস্ত্র এস. এস ১৮ দশটি 'আর্ভ' ছুঁড়তে পারে যার প্রতিটি দশ লাখ টন টি. এন. টি, বিস্ফোরকের সমান বলশালী। তুলনায়, প্রধান মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মিনিটম্যান-৩ তিনটি 'আর্ভ' ছুঁড়তে সক্ষম, যার প্রতিটি সাড়ে তিন লাখ টনেরও কম বলশালী। (হিরোশিমায় যে বোমাটি ফেলা হয়েছিলো তার বল ছিল বিশ হাজার টন।) এ ছাড়া ডাঙার ঘাঁটি থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের নিভুল লক্ষ্যভেদের সমস্যা সমাধানেও রুশ কারিগরি এগিয়ে গেলো (এ বিষয়ে কিছু মতভেদে আছে)!

মার্কিন জোর পড়েছিলো ডুবোজাহাজ থেকে ছোঁড়ার এস. এল. বি.

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা (বাংলাদেশ)

[An evaluation of the projects undertaken and presented by Ganasasthakendra Bangladesh is outlined. The real problems encountered by the Ganasathakendra are raised.]

ঢাকা জিলার সাভর থানার বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। রোগ নিরাময় ব্যবস্থাকল্পে সেইগুলিতে থাকবে রোগীদের থাকবার ঘর, অপারেশন থিয়েটার, এক্স রে যন্ত্রপাতি, চোখ-দাঁত মল-মূত্র পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। নেওয়া হবে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি। পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী নেওয়া হবে, স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প চালু করা হবে, একটা ছোট গবেষণাগার গড়ে তোলা হবে যেখানে ভেষজ গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরী করা যেতে পারে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রামের মানুষদের সচেতন করার প্রয়াসে পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকবেন ডাক্তার, নার্স, শিক্ষণপ্রাপ্ত সহায়ক কর্মীর দল। তবে যে কোন স্বাস্থ্য-আন্দোলনের সফলতার অন্যতম ভিত্তি যেহেতু গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়নে, তাই বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় (যেমন জুতো তৈরী, পাটজাত চারুশিল্প ইত্যাদি) দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষাদানের কার্যক্রম নেওয়া হবে, গড়ে তোলা হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের শিক্ষাকেন্দ্র। পশ্চাদ্‌পদ গ্রামীন অর্থনীতিতে নারীরাই সবচেয়ে পেছিয়ে থাকা অংশ। সংস্কার আর মানবিক অবমাননার থেকে মুক্তির সংগ্রামে যদি নারীদের অংশগ্রহণ না ঘটে, তবে জন স্বাস্থ্য আন্দোলনও বিকাশ লাভ করে না। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণে এঁদের বিশেষ গুরুত্বদান সেই বোধে স্ফুট।

এমনতর একটা পরিকল্পনার ছক নিয়ে গণ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিভিন্ন গ্রামে যে কর্মযোগ নিয়েছিলেন, তার একটা মূল্যায়ণ এঁরা করেছেন। ডি হাইড্রেশনযুক্ত ডায়োরিয়ায় মৃত শিশুর হার এই গ্রামাগুলিতে (যেখানে এঁরা কাজ করেছেন) লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে - সারা দেশে এধরনের মৃত্যুর হার ১০০০ এ ১৭ জন। আর এই গ্রামগুলিতে সেই হার ১০০০ এ ১২ জন। এ ধরনের অসুখে "Oral fluid" গ্রহণের পক্ষে এঁদের প্রচার সম্ভবতঃ এই সফলতার ভিত্তি। বিভিন্ন ধরণের চর্মরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশ কমে গেছে। গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণের জন্য এঁদের প্রচারের ফলে প্রসবকালীন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব এঁদের গ্রুপের বিভিন্ন কর্মধারায় গ্রামের নারীদের যুক্ত করার সফল প্রয়াসে। স্বাস্থ্য-প্রকল্পের মোট ১১৪ জন কর্মীর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৪৬ জন। বিভিন্ন কাজে—কি কৃষিকাজে, কি শিক্ষাদানে, গ্রামের মহিলারা পুরুষদের মতই সুযোগ-সুবিধা ও বেতন পাচ্ছেন। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় ছেলেদের সাথে মেয়েরাও শিক্ষা নিচ্ছেন। মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও এই গ্রামগুলির নারীদের মধ্যে এসেছে লক্ষণীয় পরিবর্তন। কোন মহিলা রোগী আজ আর স্বাস্থকেন্দ্রে বোরখা পরে আসেন না, গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যোগে মহিলা কর্মীর অভাববোধ আজ আর এঁদের পীড়িত করে না। সারা বাংলা দেশে বিশেষ আলোড়ন উঠেছিল, যখন ১৯৭৭-এর ১লা মে এই স্বাস্থ্য-প্রকল্পের সাথে যুক্ত ২৩ জন নারী "বিশ্ব নারীমুক্তি আন্দোলনের" প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপনে সাইকেলে চড়ে সাভর থেকে ঢাকায় যান। গণ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যোগে নারীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশ সরকারের পরিবার-পরিকল্পনা ও প্রাথমিক শিক্ষাদানে নারীদের নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু এই ধরণের কার্যক্রম মসৃণ পথে এগিয়ে চলবে প্রতিকূল সামাজিক কাঠামোর গণ্ডীতে, এমন ভাবনা যে নেহাৎই স্বপ্নবিলাস, এই মূল্যবান শিক্ষাটি এঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ। ২৫ বছরের যুবক নিজাম—একজন প্যারা-মেডিকেল কর্মী হিসাবে গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মযোগে প্রথম থেকেই তাঁর যোগ। শিমুলিয়া গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় নিজাম। শংকিত হয়ে ওঠেন গ্রামটির একমাত্র পাশকরা ডাক্তারবাবু। তাঁর পসার বুঝি যায়, স্বাস্থ্য নিয়ে মুনাফার মোক্ষম কারবারটি বুঝি এবার যায়। ডাক্তারবাবু, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও বোর্ডের আর একজন সদস্যের যোগসাজসে ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে নিহত হন নিজাম। এরকম জীবন-মরণ সংগ্রামের মুখে আজ স্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা। এ মুহূর্তে তাঁদের তাই আত্মজিজ্ঞাসা—প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের মুখে কি সমস্ত কর্মপ্রয়াস আজ অথবা কাল ভেঙ্গে পড়বে? প্রতিকূল সামাজিক কাঠামোর মাঝে কি টিকে থাকতে পারে এমন ধরনের সংস্থা?—এ দেশের গণ-স্বাস্থ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বোধ হয় প্রশ্নটি গুরুত্ব দাবী করে।

অংশুতোষ খান

স্কাইলাব কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ?

স্কাইল্যাব মহাকাশে যাত্রা করেছিল ১৪ মে, ১৯৭৩। নামেই প্রকাশ এটা একটা মহাকাশে গবেষণাগার-উদ্দেশ্য পরবর্তীকালে মহাকাশযাত্রীরা স্কাইল্যাবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরিক্ষা চালাবেন যার একটা হ'ল দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ বিচরণ-এর ফলে নভোচারীদের শারীরিক সুস্থতা কিভাবে ব্যাহত হতে পারে তা দেখা, দুই আবহাওয়া এবং পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধান, তিন বায়ুমণ্ডলের স্তরের বাইরে থেকে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালান এবং কিছু মিশ্র ধাতুর উৎপাদন যা শূন্য ভরেই করা সম্ভব। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত ফলে যা যা জানা গেছে ত হ'ল মরুভূমি অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাপ, গলফ ষ্ট্রীম এবং ঠাণ্ডা জল মিশে আবহাওয়ার পরিবর্তন কিছু চমকপ্রদ জীববিজ্ঞানের পরীক্ষা—নমুনাস্বরূপ মাকড়সা শূন্য অভিকর্ষে জাল বুনতে পারে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবার সময় কম লাগে ইত্যাদি, এবং পরিশেষে সৌরকলঙ্ক এবং সৌরঝটিকার সম্পর্কে বিষদ বিবরণ।

স্কাইল্যাব পরিকল্পনার যুগ ছিল ১৯৬৮ সাল—মানুষের চাঁদে পদক্ষেপের এক বছর আগে। মনে রাখা ভাল এ সম্বন্ধে ক্যালটেকের জেট প্রপালশন ল্যাবের ডিরেক্টর Bruce Murray-এর বক্তব্য "We did not go to moon for science, national prestige and strategy was our goal"। তাই সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হতে এবং ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকাতেই এই দুকোটি ডলার প্রকল্পের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কমে যাওয়া বাজেটে এপোলোর পড়ে থাকা যন্ত্রাংশ দিয়ে স্কাইল্যাব তৈরী হোল। ফলে স্কাইল্যাব মহাকাশে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবে না এটা শুরুতেই জানা ছিল। তাড়াহুড়ো করে পাঠানো স্কাইল্যাব উৎক্ষেপনের সাথেই তার উল্কা আর তাপের আচ্ছাদনটা হারায় এর সাথে সৌর ব্যটারীর একটা ডানাও খুলে পড়ে, দ্বিতীয়টা যায় আটকে। স্কাইল্যাব তাই জন্মলগ্নেই পঙ্গু। পরে মহাকাশচারীরা গিয়ে কিছুটা সামাল দেন। ৮ ফেব্রু, ১৯৭৪ শেষ তিনজন আমেরিকান অভিযাত্রী ফিরে এলে নাসার কর্মকর্তারা স্কাইল্যাব সম্বন্ধে আর মাথা ঘামাতে নারাজ হন—'We slammed the hatch on skaylab in 1974.' ইতিমধ্যে ১৯৭৫ সালে ওই স্কাইল্যাবের ছয় হাজার পাউণ্ডের ওজনের মালবহনকারী কক্ষের তিনভাগ পড়ে সমুদ্রে আর এক ভাগ আজোরস দ্বীপের কাছে। ২৭০ মাইল ওপরে আবর্তমান স্কাইল্যাবের অবস্থা তখন সঙ্কটজনক। সৌরকলঙ্কের অস্বাভাবিক তৎপরতার ফলে বায়ুমণ্ডলের যে স্ফীতি তাতে ঘটে স্কাইল্যাবের ওপর বায়ুর টান বাড়তে শুরু করে এবং স্কাইল্যাব ক্রমাগত উচ্চতা হারাতে থাকে—পতনোন্মুখ স্কাইল্যাবকে ঠেকানোর জন্য কিছু প্ল্যান দেওয়া হয় কিন্তু হয় খরচের অজুহাতে নয় সময় কম বলে কিছুই কার্যকরী করার প্রচেষ্টা করা হয়নি। আসলে তখনও পর্য্যন্ত মহাকাশ থেকে নেমে আসা যন্ত্রাংশ সমুদ্রে বা আফ্রিকার জঙ্গলেই পড়েছে অতএব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে ভাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। ১৯৭৮-এর জানুয়রীতে কসমস কিন্তু পড়ল কানাডায়। তেজস্ক্রিয়তার বিপদ আর মহাকাশযানের যন্ত্রাংশ পড়ার বিপদ সম্বন্ধে পাশ্চত্যের লোকেরা খুবই বিচলিত হলেন। ততদিনে হিসেব করে জানা গেল সুদূর ১৯৮২ নয় ১৯৭৯ তেই স্কাইল্যাব পড়বে। সাথে সাথে এও জানা গেল NORAD-এর এত বিশদ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার সামরিক বা অসামরিক বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করেও বলতে পারছেন না স্কাইল্যাব কোথায় পড়বে ৫০° উত্তর বিষুবরেখা থেকে ৫০° দক্ষিণ ১১ ক্ষোটি বর্গমাইল জুড়ে অর্থাৎ পৃথিবীর স্থলভাগের ৫৬ ভাগের যে কোন জায়গায় স্কাইল্যাব পড়তে পারে। যে ৫০০ টুকরো হয়ে স্কাইল্যাব ভগ্নাংশ ভেঙ্গে পড়বে তা ১ লক্ষ লোক বাস করে এমন শহরে পড়ার সম্ভাবনা ছিল ৭ ভাগে ১ ভাগ, মাত্র ১০% পৃথিবীর লোক এই বিপদমুক্ত ছিল। বিপদ মোকাবিলা করার জন্য যা করা যেতে পারত তা হল ৯০ মাইল ওপরে ঘন বায়ুমণ্ডলে ঢোকার ১২ ঘণ্টা আগে স্কাইল্যাবের শেষ ছ'হাজার পাউণ্ড জ্বালানীর কিছুটা ব্যবহার করে (১) "কম drag position-এ" আনা যাতে স্কাইল্যাব আরও কিছুক্ষণ কক্ষে থাকে (২) স্কাইল্যাবকে ধাক্কা দিয়ে পৃথিবীর বুকে এনে ফেলা (৩) কিছুই না করা। শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে আমেরিকা দ্বিতীয়টি বেছে নেয় এবং তার জন্য অষ্ট্রেলিয়া সরকার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

অতএব বিজ্ঞানীরা অনেক সময় বিজ্ঞানের প্রয়োজন না হলেও জাতীয় গর্বে মেতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষায় ব্যাপৃত হচ্ছেন যার ফলাফল এমন একদল মানুষকে ভোগ করতে হতে পারে যাদের এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার অধিকার স্বীকার করা হচ্ছে না। মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হোক এটা নিশ্চয়ই কাম্য কিন্তু তা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিচালিত হোক এটা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। মহাকাশে পাঠানো সোভিয়েট রাশিয়ার ৪১৬৩টি আমেরিকার ১১৩ টি এবং অন্যান্য দেশের ৭৮টি উপগ্রহ মহাকাশের থেকে প্রাকৃতিক নিয়মই নেমে আসবে। তারাপুরের আণবিক চুল্লী পরিদর্শনের অধিকার যারা চায় আজ তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে যে আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা মারফৎ সামাজিক প্রশ্নের সাথে জড়িত সমস্যাগুলোর ওপর শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলোর বক্তব্য যেন গুরুত্ব পায়। স্কাইল াব পতন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত মাত্র এটা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

অশোক ঠাকুর, বিজ্ঞান কলেজ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সাহা ইনষ্টিট্যুটে বিভিন্ন স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এক কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গের স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলির যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ২৫শে জুন প্রস্তুতি কমিটির এক সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তুতি কমিটির বিলুপ্তি এবং যুক্ত সংগ্রাম কমিটি (JACARI) গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত করা হয় যে সংগ্রাম কমিটির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন বা অ্যাসোসিয়েশন প্রেরিত প্রতিনিধিই সংগ্রাম কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য বলে গণ্য হবেন। সভায় সাহা ইনষ্টিটিউটের শ্রীবিনায়ক দত্তরায় এবং কলেরা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের শ্রীজ্ঞান শীল সর্বসম্মতিক্রমে যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। শ্রীদত্তরায় কোষাধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করবেন। মোট সাতজনকে নিয়ে এক সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। দু'জন আহ্বায়ক ছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীতে আছেন সাহা ইনষ্টিটিউটের দুর্দান্ত রায় ও জয়ন্ত দাশগুপ্ত, গ্লাস এবং সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বি. দত্তগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অতীশ দাসগুপ্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সুব্রত পাল।

'জ্যাকারি' সংগঠিত আন্দোলন

জরুরী অবস্থাকালে সাহা ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বরখাস্ত কর্মী শ্রীমৃণালকান্তি বসাকের পুনর্বহাল ও ইনষ্টিটিউটের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসানের দাবীতে গত ২০শে জুলাই বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে সাহা ইনষ্টিটিউটের সামনে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইউনিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েশনের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি (JACARI) আয়োজিত এই সমাবেশে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শতশত কর্মী গবেষক ও শিক্ষক অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে বিক্ষোভের সম্মুখীন না হতে চেয়ে ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডি, এন, কুণ্ডু আগেই বোম্বে পালিয়ে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে যুক্ত সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর অজিত সাহার কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শ্রীসাহা প্রতিনিধিদলের সাথে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করেন এবং সে কারণে সমাবেশ থেকে তাঁকে ধিক্কার জানানো হয়!

এরপর এক দীর্ঘ মিছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। সেখানে সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সাথে দেখা করেন এবং এক স্মারকলিপি পেশ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপাচার্য অধ্যাপক রমেন পোদ্দার পদাধিকারবলে সাহা ইনষ্টিটিউটের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান। সংগ্রাম কমিটি শ্রীবসাকের পুনর্বহাল এবং নিয়ম বহির্ভূত বহু কার্যকলাপের জন্য ডিরেক্টরের অপসারণ এবং শাস্তি দাবী করে। উপাচার্য সংগ্রাম কমিটির দাবীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে গত ১২ই এপ্রিল যুক্ত সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে ডিরেক্টর ডি, এন, কুণ্ডুর কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে শ্রীবসাককে অবিলম্বে পুনর্বহাল না করলে যে পরিণতি হবে তার জন্য তিনিই দায়ী হবেন। সেদিন সাহা ইনষ্টিটিউটের কর্মী সংগঠনের উদ্যোগে সংগ্রাম কমিটির দাবীর সমর্থনে এক সমাবেশ আয়োজিত হয়েছিল।

অধ্যাপক রমেন পোদ্দার উপাচার্য হবার পর সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর সাথে দেখা করা হয় এবং ইনষ্টিটিউটের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করা হয়। পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যান অধ্যাপক পোদ্দার শ্রীবসাকের পুনর্বহালের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও ডিরেক্টর কিন্তু আগাগোড়াই অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছেন।

যুক্ত সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে অপর একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ই আগষ্ট কলেরা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে। যুক্ত সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে এক গণডেপুটেশন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের কাছে বরখাস্ত বৈজ্ঞানিকের পুনর্বহাল ও কর্মী সংগঠনেরনেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে বক্তব্য পেশ করে। ডেপুটেশনের পক্ষ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত ৩রা আগস্ট যুক্ত সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিগণ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী যুক্ত সংগ্রাম কমিটিকে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।

সুব্রত পাল

Press-Release from the Employees Union, Physical Research Laboratory, Ahmedabad

On 30th June, 1979, the Physical Research Laboratory, Ahmedabad, inducted the Central Industrial Security Force and abolished the posts of the

old guard system by their letter to guards dated 30th June wherein it is clearly stated that, 'the posts of Guards cease to exit from 30th June'. This authoritarian rule was made to punish the guards as they had taken part iu the Trade Union activity as well as protested against the arbitary manangement of PRL. This grave injustice by the PRL Management was strongly protested by the employees of PRL and on 7th July 1979 after a strong but peaceful agitation the PRL management agreed to give some alternate jobs to the old security guard system. The management however made no move to remove the CISF from PRL even though the employees strongly resented the presence of the paramilitrary organisation in PRL. The PRL employees union then filed a writ in the Gujrat High Court and the Court has ruled that the guards should not be retrenched or the posts of guards should not be abolished from PRL. After this the management employed all the security guards in the PRL Quarters and so now in PRL there are two guard systems, the CISF in the laboratory and the old Guards System in the Quarters. In a poor country like India, it is indeed a luxury to have to spend lakhs of rupees on a totally unproductive security system in a small laboratory like PRL and its Quarters, simply to save the prestige of the management. Immediately after the high court decision, the management promptly punished all the old security guards by stopping their one month's wage with the charge that the guards have shouted slogan and agitated. This vindictive attitude of the PRL management clearly shows their strong opposition towards any legitimate union activity. We appeal to all trade union leaders of this city as well as in large to lend us their support or else our new union (registered this year) will get stamped out under the autocratic rule of the PRL management. We will, on our part agitate till the end to achieve our legitimate rights. After the death of our beloved Vikram Sarabhai, who had started PRL, the story of PRL is one of nepotism. In the name of Advanced Scientific Research, our scientists have exploited the limited resources of our country. We will take up this issue also in future but our immediate demand is to remove CISF from PRL and reinstate the old guard system. We appeal to all readers to take an indepth look at our problem and lend us their valuable support.

স্টকহমের আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা সংস্থার ১৯৭৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের প্রয়োজনে এখন প্রতি মিনিটে দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়। এই সংস্থা হিসাব করে দেখিয়েছে যে যুদ্ধাস্ত্র কেনাবেচার বছরে দুই হাজার কোটি ডলার পরিমাণ অর্থ হাতবদল করে; আর এর তিন চতুর্থাংশেরই ব্যয় বহন করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। ১৯৭৮ সালে সব চেয়ে বড় যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহকারী দেশ ছিল আমেরিকা, যার হাতে ছিল সারা পৃথিবীর বাজারের ৪৭ শতাংশ। ইউ এন এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রতিদিন গড়ে যে একশ কোটি ডলারেরও বেশী অর্থ খরচ হয় তার পরিমাণ স্বাস্থ্য খাতে বিশ্বের সব দেশের মিলিত খরচের আড়াই গুণ বেশী, আর শিক্ষা খাতে খরচের দেড় গুণ। একজন সৈনিককে ধ্বংসের অ-আ ক-খ শেখাতে যা খরচ করা হয় সেটা একটি শিশুকে সৃষ্টির অ-আ-ক-খ শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় খরচের ষাট গুণ।

বিজ্ঞান মনীষা—মেদিনীপুর সায়েন্স ফোরাম নামে একটি সংগঠন থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান মনীষা' বাংলায় জনবোধ্য বিজ্ঞান প্রচারের কাজে এক উল্লেখযোগ্য অংশীদার। বর্তমানে এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ চ'লছে। পত্রিকাটিতে আন্তরিকতা ও সংগঠকদের তরফে নিপুণ প্রচেষ্টার ছাপ স্প.। উপস্থাপিত বিষয়গুলি বেশ সরলভাবে আলোচিত হচ্ছে ; কোথাও অহেতুক জটিলতা আরোপের চেষ্টা নেই। বিষয়বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। পরপর সংখ্যাগুলিতে লেখার মান উত্তরোত্তর ভাল হচ্ছে. আগামী দিনের জনমুখী বিজ্ঞান আন্দোলনে এই পত্রিকার কাছ থেকে বিশেষ ভূমিকা আশা করা যেতে পারে।

Bulletin of the Assocation of scientific workers of India—The Association of Scientific Workers of India (ASWI in short) is supposed to be the central organisation of scientific workers of this country and as such, its organ BASWI should be considered to be an extremely valuable journal for our scientific workers. For only such a central organ can carry out the task of generating detailed discussions and broad consensus regarding the fundamnetal problems of the scientific workers' movement in our country, of transcending regional peculiarities and of integrating scattered efforts into one coherent motion. This, however, is something that the BASWI has been consistently far from achieving and in this failure it has only mirrored the inadequacies of ASWI itself. This is not the place to analyse whether the principal responsibility for this lies with the mass of scientific workers or with the leadership of ASWI, but one shortcoming can very definitely be pinned on the leadership, or, to be more precise, on the editorial board of BASWI, namely a chronic neglect on the part of the bulletin

For All Electrical, Electronic Components & equipments and any other odd items :

Please Contact :

D. S. ENTERPRISES

52/9C, B. B. GANGULY STREET (1st Floor),
CALCUTTA-700 012

We also supply Hydrogen, Nitrogen, Oxygen and other sylinders of various capacities, Silica & Quartz tubes of different sizes.

of presentation and analysis of concrete problems concerning the use of science in Indian Society. Rarely does it reward its readers with original articles dealing with specific and topical issues wherefrom they can form an authentic understanding of the role that science is actually playing in our country. Instead one mostly finds reprints or extracts of articles written by foreign scientists and scientific organisations, declarations of international bodies. and related committee and conference reports. Even when material specifically dealing with problems of science in our own country appears, it is mostly in the nature of reprint or adaptation and that too abounding in reiteration of vague and general propositions. As a result, the bulletin lacks precisely that measure of sharpness and direction without which it could not even begin its task of organising opinion of the scientific workers' community. Even a cursory perusal of recent issues BASWI will confirm this appraisal. Particularly awkward is the bulletin's marked disposition towards reprinting arlicles or documents of world federation of scientific workers (WFSW). Granted that documents from the World Federation or from the international scence are necessary for providing the proper setting to our own movement, but an excessive emphasis on these, to the extent of relegating our own thinking to the background, can do nobody any good. Notable exceptions to this trend so far as recent issues of the bulletin are concerned, are to be found in the annual report of ASWI general secretary in the April 1979 number and in the articles appearing in July 1979 number. The latter issue contains an interesting piece of polemic between two powerful lobbies of scientific bureaucracy one represnted by Atma Ram backed by Morarji and the other bearing the stamp of Nehruite 'socialism' (The recent tussle between these two lobbies on the question of reorganisation of CSIR may be recalled in this connection). However, even in case of such exceptions the material presented is lacklustre and unsuitable for a central organ like BASWI.

In short the bulletin could do with a little more determined effort on the part of its organisers and of course, with some more involvement from the scientific workers in general. Revitalizing BASWI should be a major concern of fellow scientific workers of our country to-day.

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র জন্য নবগঠিত পত্রিকা উপসমিতি

বর্তমান সংখ্যা থেকে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার কাজ পরিচালনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতি নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি পত্রিকা উপসমিতি মনোনীত করেছেন :

পার্থ সেন (নরসিংহ দত্ত কলেজ, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক), অংশুতোষ খান (বিজ্ঞান কলেজ), সুব্রত ভট্টাচার্য (উলুবেরিয়া কলেজ), শান্তনু দত্ত (বিজ্ঞান কলেজ), দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী (বিড়লা কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড এডুকেশন), অশোক ঠাকুর (বিজ্ঞান কলেজ), অভিজিৎ লাহিড়ী (বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ), সুব্রত পাল (বিজ্ঞান কলেজ), পার্থপ্রতিম মজুমদার (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট), অজিত চন্দ (ক্লোরাইড ইণ্ডিয়া) ও সজল রায়চৌধুরী।

সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার পদাধিকার বলে এই উপসমিতির সভ্য নিযুক্ত হয়েছেন।

উপসমিতির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় ও স্থান :

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা-৯টা

C/o—ডি. এস. এন্টারপ্রাইজেস

৫২/৯ সি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০১২

উপসমিতির কাজে সক্রিয় সাহায্যের জন্য সকল বিজ্ঞানকর্মী বন্ধুদের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : (সাধারণ) তিন টাকা

(ডাকে) সাড়ে চার টাকা।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।